



“আসুন আমি আপনাদের স্থানটি এবং ক্যাম্পসাইটটি আগে ঘুরিয়ে দেখাই এবং আমাদের নিয়ম সমুহ জানাই”।

রিসেপশনের পঞ্চাশোত্তীর্ণ মহিলা আমাদেরকে সংগে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। এমনটি সাধারণত আমার পূর্বাভিজ্ঞতায় কখনো পাইনি বলে একটু বিস্মিত ভাবেই সিভিলীকে আমার কোলে নিয়ে লিপি সহ অনুসৃত হলাম ভদ্রমহিলা। তখন সন্ধ্যা ৬টা কি ৭টা হবে। অন্য ন্য রা ইতিমধ্যে ই সারাদিন ইচ্ছামত ঘুরে, দেখে উপভোগ করে কাঁরাভান অথবা তারুতে ফিরে সান্ধ্য ভোজনের আয়োজনে ব্যস্ত এবং এমন সময় নতুন প্রতীবেশীর আগমনে উৎসুক দৃষ্টি কাড়ার আরো একটি কারণ হলো আমাদের ভারত উপমহাদেশীয় গাত্র বর্ণ। ইউরোপে কা স্পিং হিলডের বিষয়টি এখনো সাদাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ রয়ে গিয়েছে। সেখানে অন্য বর্ণের ১০ মাসের সর্বদা হাস্যাত্মক সিম্বল-মিষ্টি সিভিলী এবং ষষ্ঠ মাসের গর্ভবতী লিপি সহ আমার ছোট্ট ফল মিলিটা সবার উৎসুক দৃষ্টি একটু বেশী করেই আকর্ষণ করছিল। তবে দৃষ্টির হাস্যময়তায় একেবারে পরিচছন্ন স্বাগতম ফুটে উঠছিল যেন। হাটার পথের এই অল্পটুকু পথেও কেউ কেউ ছোট্ট মিষ্টি সিভিলীর হাস্য ময় উদ্ভিগু মুখাবয়বের সাথে নিজেদের মুখেও হাসি ফুটিয়ে ওর ছোট্ট দুটি হাতের সাথে হাত নেড়ে উত্তরপ্রদানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

এই স্থানটি আপনাদের জন্য। দেখুন যথেষ্ট প্রশস্ত, পাশেই গাড়ি রাখতে পারছেন, টয়ালেট নিকটবর্তী এবং পাশের গাছদুটির জন্য সুন্দর ছায়াও রয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি সহ এখানকার নিয়ম কানুনের বারদুয়েক পুনরাবৃত্তি সহ ভদ্রমহিলা যখন বিড়াল তিনটির চারিত্রিক বর্ণনায় এলেন আমাকে মুখাবয়বের হাসির পর্দা তুলে নিতেই হল। এমনতেই আমি পূর্বে টেলিফোন করে বুকিং দিয়ে এসেছি, তারমানে নিশ্চয় কিছুটা জেনে বুঝেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কোন একসময় ধন্য বাদ জানিয়ে আমাদের গাড়িটা নির্ধারিত স্থানের পাশে পার্ক করে তাবু সহ নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের স্থাপনা শুরু করলাম—

- ০. তাবুর দু অংশ। প্রথমে ভিতরের তাবু এবং পরে তার উপরে বাইরের অংশ।
- ০. তাবুর ভিতরে এয়ার ম্যাট্রেস ফুলিয়ে বিছানা তৈরী।
- ০. তাবুর সামনের অংশে মাদুর এবং চাদর পেতে সিভিলীর জন্য এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলো রোদ-বৃষ্টির হাত হতে রক্ষা করতে যথোপযুক্ত স্থানের ব্যবস্থা করণ।
- ০. গ্যাসচুলী-স্থাপন এবং গ্যাস সংযোগ
- ০. চেয়ার-টেবিল স্থাপন
- ০. কাপড় শুষ্কানোর তার খাটানো এবং
- ০. গাড়ী হতে প্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রীগুলো বের করে যথাস্থানে রাখা, যেন প্রয়োজনের মুহুর্তে হাতের কাছেই পাওয়া যেতে পারে, ইত্যাদি কাজগুলো আমার একঘণ্টার মাঝে সারা হয়ে গেল।

লিপি প্রথমত সিভিলী সহ আমাদের সান্ধ্য খাবার তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। সুইজারল্যান্ডের ইন্টারলাকেনের এই ক্যাম্পিংসাইটটি চতুর্দিক পর্বত ঘেরা অঞ্চলের মাঝে একটু সমতল ভূমি, পর্বতগুলি আল্পস পর্বতমালার অংশ। ডানদিকেই আল্পসের সর্বোচ্চ অংশ (Junng Frau (Top of Europe)) বরফ ঢাকা সাদা হয়ে আছে। আমাদের ক্যাম্পিংসাইটটিতে পর্বতের ছায়া এসে পড়লেও গ্রীষ্মের ইউরোপের সন্ধ্যার সুর্যালোক Top of Europe এর সাদা শৃঙ্গতে পড়ে ঝিক্‌ঝিক্‌ করে উঠেছে। আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম ওগুলোর স্থির এবং চলচ্চিত্র ধারণ করতে।

- ০. সামারে ক্যাম্পিং হিলডে উদযাপনে আমার পছন্দে কারণগুলি নিম্নরূপ:
- ০. প্রকৃতির অনেক নিকটতর।
- ০. স্বাধীনতার যথেষ্টতা।
- ০. নিজস্ব যান সংগে থাকায় ঘুরে দেখার অব্যাহত স্বাধীনতা।
- ০. পিকনিক সমগ্র তিতি ক্লাস্ত অপরাহ্নও সন্ধ্যা।
- ০. এবং সুলাভ।

বাস্তবিকতার ঝামেলায় বিগত কয়েক বৎসরে না হয়ে ওঠায় এবার আমার মনটা যেন ছুটে গিয়েছিল ক্যাম্পিংএ। কিন্তু বাস্তবতার রেশ তবুও পুরোপুরি গ্রীষ্মের সিগন্যাল দিচ্ছিল না। সিভিলীর বয়স ১০ মাস মাতৃগর্ভের বাইরে। আরো একজন ৬মাস মাতৃগর্ভের ভিতরে।

তবুও এক সময় ইচ্ছারই জয় হল। আমাকে সবসময় পর্বত এবং সমুদ্র এক অশেষ হাতছানি দিয়ে ডাকে সুতরাং সিদ্ধান্ত নিলাম প্রথমে পর্বতের মাঝে এবং তারপর ভূমধ্য সাগরের নীল জলে। ইউরোপীয় আল্পস পর্বতমালা রয়েছে অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড, দক্ষিণ ফ্রান্স এবং উত্তর ইটালী জুড়ে। প্রথমে ভেবেছিলাম অস্ট্রিয়াতে আল্পসের মাঝে ঢুকবো। কেননা মধ্য গ্রীষ্মের এই সময়টাতে শুধু ভাল আবহাওয়াই আশা করা যেতে পারে আর রৌদ্রজ্বল আবহাওয়া ব্যতিরেকে পর্বতের মাঝে উপভোগের পরিবর্তে শুধু দুর্ভাগ্য পোহাতে হবে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস শেষ পর্যন্ত আমার রুটকে পাল্টে অস্ট্রিয়া থেকে সুইজারল্যান্ড নিয়ে গেল।

বৃষ্টি হলে তাবুর জীবন থেকে উপভোগকে ঝেঁটিয়ে বিদায় দেয়া যেতে পারে। কেননা ওটি পাতা হবে মাটির উপর। যদিও ভিতরের তাবুরটির নীচের অংশ ওয়াটার প্রুফ তবুও কারই বা মন চাইবে তাবুর বাইরে বেরিয়ে ছুটিরদিনে কদমাস্ত্র মাটির জীবন? আমাদের যাত্রা শুরুর দিন নির্ধারিত ছিল ৪ঠা জুলাই রোববার। অফিসে অনলাইনে ইন্টারলাকেনের পরবর্তী সপ্তাহের আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখে মন খারাপ হয়ে গেল। রোববার পর্যন্ত আবহাওয়া ভাল এবং তারপর থেকে ক্রমশ খারাপ হতে থাকবে। সম্প্রতি পান্টাতে বাধা হলো। শ্রু বার অফিস থেকে ফিরেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। ক্রা স্পিংএর প্রস্তুতি সাধারণ ছুটির প্রস্তুতি অপেক্ষ কয়েকগুন বেশী। কারণ গন্তব্য স্থলে আমাদের জন্য কোন সজ্জিত রুম অথবা বাংলা অপেক্ষ করবে না, বরঞ্চ নিরাপদ একটি খালি জায়গা মাত্র, যেখানে সব কিছু নিজেদের তৈরী করে নিতে হবে।

চলচ্চিত্রীয় কায়দায় গোছানোর পালা শুরু হল এবং পরবর্তী দিন শনিবার ৩ড়া জুলাই সকাল ১০টা পর্যন্ত গাড়ির বুট থেকে শুরু করে ছাদের উপরের জেটবক্স পর্যন্ত কানায় কানায় ভরে প্রস্তুতি পূর্ণ শেষ হল। হু! এবার ঘাম মুছে নিজেদের প্রস্তুত করে সকাল ১১টায় গাড়ী ছাড়লাম আমরা জার্মানির ফ্রাংকফুর্ট থেকে সুইজারল্যান্ডের ইন্টারলাকেনের উদ্দেশ্যে।

সংগে আনা গ্যাসসিলিন্ডে অস্পিকিছুক্ষনের মাঝেই লিপি মুক্তকাকেশের নীচে সান্ধ্য ভোজন তৈরী করে টেবিল সাজিয়ে ফেলল। সিভিলী ইতিমধ্যে তাবুর মাঝে এয়ার-ম্যাট্রেস এর সজ্জায় মজাকারে ঘুমাচ্ছিল। সূর্য তখন পর্বতের পেছনে ঢলে পড়ছে। পর্বতঘেরা মুক্তকাকেশের নীচের এ সান্ধ্যভোজনের টেবিলে আমাদের আলো ছড়াবে টিম টিম করে প্রজ্জ্বলিত একটি মোম। পাঠক এমন একটি অলীক কল্পনা প্রবন মুহূর্ত উপন্যাস থেকে শুরু এ সময়ের জন্য ই যেন হঠাৎ করে আমাদের জন্য বেরিয়ে এসেছিল।

পরবর্তী দিন রোববার সকালের সূর্য পর্বত পেরিয়ে যখন উপরে আমাদের সম্ভাষণ জানাল তখন আমরা বাধ্য হলো আমাদের ৩ কোনা ঘরের (তাবু) বাতাসজাজিমের আরাম দায়ক সজ্জাত্যাগে। কারণ রোদ পেলেই তাবুর মাঝে তাপমাত্রা বেড়ে যায়। আমাদের বর্তমান ক্যাম্পসাইটটি চার তারকা খচিত এবং বাথরুম, টয়লেট সহ সমস্ত পরিবেশ ভীষণ পরিচ্ছন্ন। সকালে প্রাতঃক্রীয়া প্রাতঃরাশ সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম ইন্টারলাকেন ঘুরতে।

পর্যটনের সকল প্রকার বিনোদন এখানে বিদ্যমান এবং এলাকাটা শুরু পর্যটকেই পূর্ণ। জাপানীজ এবং আমেরিকান পর্যটক প্রচুর। অর্থাৎ ইউরোপের বাইরে অন্য মহাদেশীয় ট্যুরিস্টরা ইউরোপ ভ্রমণ করতে হলে যে সুন্দর স্থানগুলো নির্বাচন করেন, ইন্টারলাকেন সেগুলোর অন্যতম। আজকের আবহাওয়া ভাল হওয়ায় সকাল থেকেই লক্ষ্য করছিলাম আকাশে অনেক প্যারাসুট ভাসছে। ভাবছিলাম ভাল আবহাওয়ার এই দিনটি হয়তোবা প্যারাসুট পারদের একটি সোনালী সময়। একটু পরেই ভুল ভাঙ্গালো যখন দেখলাম প্যারাসুট পাররা সবাই সাথে আরো একজনকে নিয়ে একটি নির্ধারিত ফিল্ডে অবতরন করছে। অর্থাৎ পর্যটনের জন্য এটাও একটা শিল্প। একজন পর্যটককে নিয়ে একজন প্যারাসুট পার ডাইভ করে উঠে যাচ্ছে আল্পের উপর এবং সেখান থেকে প্যারাসুট দিয়ে একজন পর্যটক সহ ফ্লাই করে ইতস্তত বিম্বিত অথবা ইচ্ছেমত আকাশ দিয়ে উড়ে এসে লাড় করছে এ ফিল্ডটিতে।

দেখ, দেখ, দেখ লিপির চিংকারে ভিড়িও ক্রামেরা বন্ধ করে আসতে হল। দেখ তুমার ধসে পড়ছে! আরে তাইতো! পর্বতের উপর জমে ওঠা তুমারের বিশাল স্তম্ভ ধসে পড়ার মুহূর্তটি বিরল। ভাবলাম সেই বিরল মুহূর্তের সৌভাগ্য পেলাম। দৃশ্যটা অনেক দূরে। দূরবীন আনতে ভুলে গিয়েছি। ভিড়িও ক্রামেরার জুম দিয়ে দেখার চেষ্টা করেও নিশ্চিত হতে পারলাম না। দেখতে পারছি তুমারের স্তম্ভ ধসে পড়ছে, কিন্তু ধামছে না কেন? তাহলে কি জলপ্রপাত! দেখতেই হবে। মাঠের মধ্য দিয়ে ট্রাস্টার চালানোর রাস্তায় চালিয়ে দিলাম। যতই নিকটবর্তী ততই স্পষ্ট হচ্ছে। না এতো জলপ্রপাত। কিন্তু অনেক বড়। আরো, আরো কাছাকাছি এলাম। পর্বতের মাঝে সবকিছুকে, কেমন যেন ছোট মনে হয়। ঘর-বাড়ি অট্টালিকা সমূহকে আর্কি টেক্কারের মডেলের সেই ছোট ঘর বাড়ির মত মত মনে হয়। এই বড় জলপ্রপাতটিও দূর থেকে কত ছোট মনে হচ্ছিল। আমি আরো আরো কাছে চলে এলাম। এ যেন স্বর্গ। বাম পাশে তুমারাবৃত্ত কটিন পাথরের পর্বত শৃংগমালা। আমার সম্মুখের পর্বত থেকে ঝরে পড়ছে জলপ্রপাত। ডান পাশে সুবিশাল নীল হ্রদ। যার জলে আজকের রৌদ্রজল তাপমাত্রায় বিভিন্ন জন বিভিন্ন প্রকারের ক্রীড়া প্র্যাকটিস করছে। কেউবা স্পীডবোটের সাথে দড়িবেধে জলের উপরে তীরবেগে ছুটছে, আর মাঝের উপত্যকা সূর্য সমতল ভূমিতে দাড়িয়ে গাড়ী থেকে ভেসে আসা চমৎকার উপযোগী মিউজিকটির সাথে এ দৃশ্য উপভোগ করছি আমি। সুইজারল্যান্ড সত্যি যেন ছবির মত দেশ।

কিন্তু এখনো তো দেখার অনেক কিছু রয়েছে। দিন তো শেষ হয়ে আসছে। আমাদের কিছু খাদ্য সামগ্রী কেনাকাটাও করতে হবে। আজ রোববার বলে এ সাধারণ ব্যাপারটি অসাধারণ হয়ে দাড়িয়েছে। সুতরাং ছুটলাম আবার। এলাকার একটি ম্যাপ সাথে রয়েছে। ডাইভিং এ যা আমাদের প্রধান সহায়ক, মশুন ভাল রাস্তায় শারীরীক এ অবস্থাতেও লিপি সাগ্রহে মাঝে মাঝে গাড়ী চালিয়ে আমাকে সহযোগিতা করছে। এক সময় লক্ষ্য করলাম ক্রমশঃ উপরে উঠে যাচ্ছি, ভাবলাম হয়ত কিছুটা পরে রাস্তা আবার নীচে নামতে থাকবে। আমরা হ্রদের একদিক দিয়ে চালিয়ে এসে আরেকদিক দিয়ে তাবুতে ফিরেবা বলে ইচ্ছে। অর্থাৎ লেকটাকে এক চক্কর। কিন্তু একি! এতো উপরেই উঠছি! ম্যাপটাকে একটু ভাল করে তাকিয়েই ভুল ধরা পড়ল। তাইতো! এ রাস্তাতে ফিরে যাবনি। তেমনটি দেখা গেলেও এটি আসলে পর্বতের উপরে উঠে গিয়েছে। দূরম পাহাড়ের ঢাল বেয়ে আমি উপরে উঠে চলেছি। ইতিমধ্যে অনেক উপরে উঠে এসেছি তবুও বিশাল পর্বতের ঢাল বাওয়া সীমাহীন। এ রাস্তা কোথায় কবে নীচে নামবে কেউ জানেনা। প্রথম অথবা দ্বিতীয় গিয়ায়ে গাড়ী চালাতে হচ্ছে। কোন সন্দেহ নেই এই খাড়া ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে গাড়ীটা ক্রমশঃ গরম হয়ে উঠছে। আমার ADAC বীমাও শুরু জার্মানিতেই সীমাবদ্ধ। এখানে কোথাও কোন কারণে গাড়ীটা দাড়িয়ে পড়লে আমার অসহায়ত্ব সীমাহীন। ওমা! একি! গাড়ীর তেলও তো দেখি শেষের পর্যায়ে, আমাকে ফিরে যেতে হবে।

কিন্তু গাড়ী ফেরাবো কি করে? সরু চাপা খাড়া রাস্তাটার কোথাও এতটুকুন প্রস্রুতি নেই যে গাড়ী ফেরানো যেতে পারে। আমার সঙ্গে ১০মাসের শিশু এবং গর্ভবতী বধূ। গাড়ী ঘোরানোর মত একটু প্রস্রুতি স্থানের উদ্দেশ্যে উপরে উঠে যেতে থাকলাম। রাস্তার ধারের দিকে তাকালে মাথা কিছু বুঝতে দিতে না চাইলেও অনুভব করলাম আমার সেই চিরপরিচিত যন্ত্রনাটা মাথার মাঝে শুরু হয়ে গিয়েছে।

বেশ কিছুক্ষন পর একটি প্রস্রুতি স্থান পেয়ে পার্ক করলাম। মাথার যন্ত্রনাটাকে শেষ করতে, নিজেকে চাপ মুক্ত করতে সবাই মিলে গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম। হাঁ, এখানে পর্বতের গায়ে ঝুলবারানদা ওয়ালা একটি রেফ্রিজেরট এবং সেখানে অনেকে তখনো মধ্যাহ্নভোজন করছে। হঠাৎ দেখি পাশের উপরে উঁচুবার পায়ে চলার পথ ধরে লিপি তরতর করে হেটে চলেছে, পিছু ডাকতেই হিশ্ করে আমাকে থামতে বলে কান খাড়া করতে বললো। তাইতো! জলঝরার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। অনুসরণ করলাম ওকে। বেশ কিছুটা আসবার পরই আবিষ্কার করলাম এক পাহাড়ী ঝর্ণা। আছড়ে পড়ছে জল। অনেক নীচে নীলাভ হ্রদ এবং তার তীরের ঘরবাড়ী গুলোকে এখন খেলনার ঘরবাড়ীর চাইতেও ছোট দেখাচ্ছে।

সন্ধ্যায় তাবুতে ফিরে আজ আর পিকনিক অনুভবের অনুভূতি রইল না আমার। তদুপরি আজ ছিল ইউরোপীয়ান ফুটবল কাপের ফাইনাল খেলা। তাবুর পেছনে চিভি রুমে সাপেটারদের শোরগোল শোনাগেলেও আমি অর্ধম তের মত পড়ে থেকে ঘুমিয়ে গেলাম। কেননা মাথার যন্ত্রনা এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল, পরিব্রাজনের আর দ্বিতীয় কোন পথ খোলা ছিলনা আমার জন্য।

পরবর্তী দিন সোমবার সকালে ঘুম ভাঙতেই শুন টুপুর টুপুর শব্দ। বৃষ্টি হচ্ছে আর বৃষ্টির ফোটাগুলো তাবুর উপর পড়ে সুন্দর মোহময় এক শব্দের সৃষ্টি করেছে। বাতাসজাজিমের আরামদায়ক গদিময় বিছানায় লেপের নীচের উষ্ণ সজ্জায় সকালের কর্মতাড়া বিহীন আলসেমীর সাথে এ টপ্ টপ্ শব্দ মিলিয়ে সত্যি এক উপভোগ্য মুহূর্ত। কিন্তু কতক্ষণ? উপভোগেও ক্লান্তি চলে আসে পারবর্তন না থাকলে। বৃষ্টি থামতেই চায় না। তাবুও ছেড়ে বের হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তদুপরি বের লেও ভেজা কর্ণময় মাটির কথা মনে পড়লেই হলিডের সমস্ত শখ একসাথে গৃহত্যাগ করতে চাইছে। মনে হয় এর চেয়েতো বাসায় থাকাই ভাল হত।

একসময় বৃষ্টি থামলো। আমরা তাবু ছেড়ে বাইরে বেরুলাম। না! মাটির অবস্থা আমার ধারণানুযায়ী এতটা শোচনীয় নয়। দ্রুত পরিচলন হয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আজ আমরা এলাম “সেইন্ট বেয়াটস হোলেন (সেইন্ট বেয়াটস কেইভ) এ। নীচে গাড়ী পার্ক করে আল্পসের গা বেয়ে আমরা প্রায় ৮০০ মিটার উপরে উঠে এলাম। আল্পসের চূড়ায় জমে থাকা বরফ গলে বর্ণা বা জলপ্রপাত হয়ে নীচে নেমে এলেও কিছু জল পাথরের ফাটল দিয়ে ভিতরে ঢুক যাচ্ছে। ভিতরে ঢোকা এ জলরাশি একত্র হয়ে পর্বতের কোন ফাটল দিয়ে একত্রে গড়িয়ে আজ তরীণ জলপ্রপাত সৃষ্টি করেছে। ঠিক এমনি একটি গৃহ এখানে খ্রীষ্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে “সেইন্ট বেয়াটস” নামক একজন ধর্মজাযক আবিষ্কার করেন। তিনি এ এলাকার প্রাধান উপদ্রব একটি ডাগনকে হতা করে মানুষের মাঝে তার গ্রহণযোগ্যতা তৈরী করেন এবং সেই গ্রহণযোগ্যতার উপর ভিত্তি করে এখানে খ্রীষ্টি ধর্ম প্রচার করেন। আল্পসের এই গৃহাতেই তাঁর বসবাস ছিল বলে একে সেইন্ট বেয়াটস খোঁলে বা সেইন্ট বেয়াটস কেইভ নামকরণ করা হয়েছে।

সিভিলীকে কোলে নিয়ে লিপি সহ বিকেল চারটায় আমাদের ট্যুরগাইড (ট্যুরগাইড ছাড়া এখানে প্রবেশ নিষেধ) ইতিমধ্যে এখানে জমে ওঠা আমাদের গ্রুপটাকে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো। কঠিন পাথরের গাগুলো জলে ভিজ়ে আছে। তার মধ্য দিয়ে সুড়ঞ্জের পায়ে চলা পথ আলোকিত করে রাখা হয়েছে। সুড়ঞ্জের মাঝ দিয়ে বিভিন্ন স্থানে ফোটা ফোটা জল পড়তে পড়তে তৈরী হয়েছে অনেক লম্বা স্ট্যালাকটাইট। ট্যুরগাইডের বর্ণনা থেকে জানা গেল এ স্ট্যালাকটাইটগুলোর বৃষ্টি শত বৎসরে তিন মিলিমিটার। ঠাণ্ডা জলের প্রবাহে ভিতরের তাপমাত্রা অনেক কম। বিশ্বের দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে আমাদের গ্রুপের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য এক সময় আমার কোলে ঘুমিয়ে পড়লো। সুইজারল্যান্ডের ভাষা মূলতঃ জার্মান। কিন্তু স্টো জার্মানির জার্মানের মত নয়, সুইস আঞ্চলিকতা সমৃদ্ধ, যাকে ওরা নিজেরাই নামাকরণ করেছে “সুভাইচার ডুচ (সুইস জার্মান)” আর জার্মান জার্মানকে ওরা বলে “হোক ডয়েচ (উচ্চ জার্মান)।” এর দুটোই ওরা সমান তালে পারলেও জার্মানদের ওদেরটা বুঝতে অসুবিধে হয়। অনেকটা শব্দ বাংলা এবং চিটাগাং এর আঞ্চলিক বাংলার মত তুলনীয়। এজন্য ট্যুরগাইড সুন্দরী যুবতী প্রথমে আমাদের দেখে ব্যথিত হয়ে উঠলেও পরে যখন জানতে পারলো যে আমরা জার্মান বলতে পারি তখন দ্বৈত ভাষায় বর্ণনার হাত থেকে রেহাই পেয়ে মুখাবয়বে অপরিপূর্ণ সুন্দর হাসি ছড়িয়ে নিজেকে আরো সুন্দর করে তুললো।



চলার পথের মাঝে মাঝেই থেমে থেমে গাইড আমাদের সবকিছু বুঝিয়ে বলছিল। এক ঘণ্টা পায়ে চলা পথে চলে আমরা সুড়ঞ্জের শেষ প্রান্তে এলাম। আভ্যন্তরীণ জলপ্রপাত এখানে দুমড়ে আছড়ে পড়ছে। আল্পস পর্বতের কত ভিতরে চলে এসেছি। মনের ভেতরে কে যেন কুখ্যা বলে উঠলো, “এখন যদি ভূমিকম্প হয়”। শিউরে উঠে ধারণাটাকে গলা টিপে শেষ করে দিলাম। শেষ প্রান্তে এক সময় ট্যুরগাইডের বর্ণনার সাথে আলো নিভে গেল এবং বিদ্যুতের আলোয় আমরা ভয়ঙ্কর ডাগন অবলোকন করলাম। বর্ণনা শুনলাম কি করে বেয়াটস সেই ডাগনকে হতা করেছিল। মনে মনে ভাবলাম আমাদের দেশের সেই ভূতের গল্প এখানে ইউরোপেও প্রচলিত ছিল এবং কেউ কেউ এখনো বিশ্বাস করে। আবার এক ঘণ্টা পায়ে হেটে বিকেল ছটায় আমরা বাইরে বেরুলাম।

বৃষ্টি আজ আর হয়নি। পার্শ্ববর্তী “থুন” নামক মাঝারী ধরণের শহরটা ঘুরে সম্প্রায় তাবুতে ফিরলাম আমরা। আবার রোমান্টিক সম্প্রায় এবং পিকনিক। আবহাওয়ার খবর নিয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম আগামীকাল আমরা দক্ষিণ ফ্রান্সের ভূমধ্য সাগরের নীল জলের তীরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হব। রাত্রিতেই অনেক কাজ গুছিয়ে রাখলাম। গোলাপে সমৃদ্ধ আমাদের এই ক্যাম্পসাইটটি এতটাই নীরব যে আমাদের বেবীটার সাধারণ কান্নাও এখানে সবার কানে পৌঁছে যায় এবং এজন্য আমাদের রীতিমত লজ্জাই করছিল যেন নিরবতা ভঞ্জে দায়ে, কিন্তু ওতো একটা বেবী এবং একমাত্র এটাই ওর ভাষা।

সকালে ঘুম থেকে জাগতেই দেখি প্রচণ্ড বৃষ্টি। আমরা আজ সুইজারল্যান্ড ত্যাগ করবো ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে। কিন্তু তাবু যে গুটিয়ে গাড়িতে ভরবো প্রকৃতি যেন সে ফুরসৎই দেবেনা আমাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অঝোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। এমনিতেই আমরা আমাদের কাজ গত রাত্রিতে অধিকাংশ গুছিয়ে রেখেছি। আজ শুধু তাবু এবং বিছানা গোছাবার পালা। ছাতা মাথায় দিয়ে আমরা প্রাকৃতিক সেরে এসে তাবুর ভিতরেই ঠাণ্ডা প্যাকেট খাবার দিয়ে প্রাতরাশ সেরে অপেক্ষায় রইলাম বৃষ্টি ধরার। বৃষ্টি আজ ধরছেই না। ভয়ে ভয়ে রয়েছি কখন না ভিতরের তাবুর নীচের ওয়ারারুফ অংশটাতে কোন ভাবে ছিদ্র হয়ে জল ভিতরে ঢুক পড়ে। তখন ভেতরের আরামদায়ক পরিবেশটাও দৌড়ে পালাবে। অনেক পরে এক সময় একটু কমে এল। সুযোগ নিলাম এবং এর মাঝেই আধাভেজা হয়ে সবকিছু দ্রুত তুলে ফেলে এবং গোছানোর পরিবর্তে কোনপ্রকারে গাড়িতে ছুড়ে ফেললাম।

এ কেমনতরো রাজ্ঞা! পাহাড়ের গা বাওয়া রাজ্ঞা দিয়ে সেই কবে যে উপরে ওঠা শুরু করছি তো উঠছিই। শেষ হবে কবে? রাজ্ঞাটা যেন একটা সাপের মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে চলেছে। ওমা! এ যে অবিশ্বাস্য! গাড়ি এখন মেঘের মধ্য দিয়ে চলেছে। আমি জানালার কাঁচ একটু নামিয়ে দিলাম। কেমন যেন একটু ঠাণ্ডা মদির গন্ধ এল ভেতরে। আমরা পার্ক করলাম। রেস্টহাউজের মাঝে দেখলাম আমরা মাটি থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার উপরে উঠে এসেছি। গাড়ি গুলোর নম্বরপেট বলছে আমরা এখনো সুইসেই অবস্থান করছি। গাড়ি চালিয়ে মেঘের মাঝে ঢোকান এ অভিজ্ঞতা কখনোই ভোলা হবে না। বিশাল এ পর্বতের মাঝ দিয়ে এখনো সুড়ঞ্জ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি বলে গা বেয়ে চালিয়ে আমাদের আজ একে অতিক্রম করতে এতটা সময় লাগছে। মেঘের মাঝে কেমন যেন একটা সৌন্দর্য গন্ধ। ইচ্ছে থাকলেও ছোট সিভিলীটার জন্য মেঘ বেশীক্ষণ আমাদের সজ্জা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হলো।

কখন যে ফ্রান্সেটুক পড়েছি বুঝতেই পারিনি কেউ। রাজার সাইন এবং গাড়ির নম্বরগুলো ফ্রেন্স হয়ে গিয়েছে। সুইজারল্যান্ড ইস্তিক্স নয় বলে একটা বর্ডার থাকার কথা ছিল এবং আসবার পথে পাসপোর্ট না হলেও ভিগনেটে কন্ট্রোল হয়েছিল (সুইস হাইওয়েতে গাড়ি চালাতে হলে একদিন দিন বা এক বৎসর যাই হোক না কেন ২৭ ইউরোর একটি পাস কিনতে হয়)। অথচ সুইস থেকে ফ্রান্স কখন যে চলে এলাম, বর্ডার দূরে থাক নতুন দেশে প্রবেশের পর যে গতিসীমা সংক্রান্ত সাইনগুলো থাকে তাও দেখতে পেলাম না। বাংলাদেশ থেকে ফ্রান্সে আসার হয়ে ভারত গমনের অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়লো। অবশ্য কেনইবা তুলনা করতে যাই?

ফ্রান্সের “শামোনিখ (Chamonix)” এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। আবারো সেই তুষার ধবল শৃংগ সমৃদ্ধ পর্বতসমূহ। কোথাও শৃংগের উপরের জমা হওয়া তুষারের ঢল নীচে পড়তে পড়তে সেইসেই জমে গিয়েছে আর কখনো গলে যাওয়ার সময় হয়নি এবং তারপর থেকে শুষু জমেছেই। অদ্ভুত দৃশ্য। সিঁথান্ড নিয়ে নিলাম এখানে কয়েক দিন থেকে যাওয়ার যদিও আমাদের গন্তব্য ছিল দক্ষিণ ফ্রান্সের ভূমধ্য সাগরীয় রৌদ্রজল উপকূল। বিগত দুদিনের সুইস বৃষ্টি আমাদের ছুটির আনন্দটাই ইতিমধ্যে শূন্য করে এনেছিল। তো শামোনিখে মেঘলা আবহাওয়া হলেও বৃষ্টি ছিল না। আমরা একটা ক্যাম্পসাইট এবং পেস দুটোই পেয়ে গেলাম। তাবুকে মজবুত করে ফিট করতে করতে তার টুকগুলোকে যখন হাড়ুড়ি দিয়ে মাটিতে পুতিছিলাম তখন বৃষ্টির ফোটা পড়া শুষু হলো। অর্থাৎ আবার বৃষ্টি। মনটা এবার ভীষণ খারাপ হলো মন। একি পোড়া কপাল নিয়ে ছুটিতে বের হয়েছি। ঠিক তার উপর লিপির পক্ষ থেকেও অগ্রি য় কথা আমাকে যেন মড়ার উপর খাড়ার ঘাঁ দেয়া শুষু করলো ছুটি নিয়ে। আজ লিখতে গিয়ে অনুভব করতে পারছি সেদিনের মানসিকাবস্থা সত্যি কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল আমার। সিঁথান্ড নিলাম সবকিছুতে আগুন ধরিয়ে দেব। মাথার ভিতর বারু দেব পজমা হতে থাকলো। বৃষ্টিটা মনে হয় শেষাবধি আমার মনের কথা পড়তে পেরে কয়েক ফোটাতেই ভয় পেয়ে পালালো।

আমাদের এ স্থানটি ছিল আরো সুন্দর। তাবুর ঠিক মাথার উপরেই যেন ভাসছিল জমাট বাঁধা বরফ যেখানে গ্রীষ্মের উত্তপ্ত তাপমাত্রায় ফল্প পোশাকে অবস্থান আমাদের।

ফ্রান্সের পূর্ব সীমান্তবর্তী আল্পস পর্বতের মাঝের এ শহরটিও একটি উচ্চ পর্যটন এলাকা। পর্যটকে বোঝাই। তবে এখানে পর্বতারোহীর সংখ্যা অনেক বেশী এবং মূলতঃ তাদেরই যেন স্বর্গরাজ্য এখানে। আমাদের তাবুর পাশের খালি স্থানগুলো সম্প্রদায় মধ্যে ইয়ং জুটিগুলো তাবুতে ভরে গেল। তাবু স্থাপন করে ইতিমধ্যেই আমরা শহরটাকে একটু ঘুরে আগামীকালের লক্ষ্য স্থির করে কেনাকাটা সেরে তাবুতে ফিরে আমাদের সামান্য কালীন পিকনিক শুষু করে দিয়েছিলাম। লক্ষ্য করলাম এ ক্যাম্পসাইটতে অপার স্বাধীনতা। সারাদিন পর্বতারোহনের পর তাবুতে ফিরে ইয়ং ছেলে মেয়েগুলো ইচ্ছামত এনজয় করছে। কেউ পান করছে, কেউ খাবার তৈরী করছে, কেউ খেলছে, কেউ গান গাইছে ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, গ্রীষ্মে ঘড়িতে রাত দশটা বেজে গেলেও দিনের আলো বিকেলের মত তখনো থেকে যায়। সিঁথান্ড লীট খেয়ে ঘুমিয়ে গেল। আমিও মনের আনন্দে পান করছি, লিপি সাথে আনা গ্যাসলুলিতে রাতের খাবার তৈরী করছে, আমরা চুটিয়ে আমাদের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, ভালবাসা, সংসার, প্রতিলোকী বিভিন্ন দেশীয় ছেলেমেয়ে ইত্যাদি নিয়ে শেষবহীন মনখোলা আলাপ করছি, গান গাইছি ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। এইতো ছুটির দিন। এমনটাইতো হওয়া উচিত। বৃষ্টিটা আমার মনের কথা পড়ে সেই যে পালিয়েছে আর নাম গন্ধ নেই।

ক্রেন এ করে এখানে বিভিন্ন পর্বতের চূড়ায় উঠে যাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। সবচেয়ে উঁচু চূড়া “মাউন্ট ব্লঙ্ক” এ গুটার ইচ্ছা আমার। তথ্য পেয়ে দুঃখিত হলাম। গুথানকার লাইনটিতে আরো ১৫ দিন নির্মান কাজ চলবে। পর্বতের পাদদেশে আমরা তাবু খাটিয়েছি এবং এখানে এখন গ্রীষ্ম। দিব্যি দেখতে পাচ্ছি একটু উপরেই শীতকালের অবস্থান এবং সবকিছু বরফাচ্ছাদিত হয়ে আছে। ইওরোপ ঋতুবৈচিত্রের স্থান; এখন যখন সবকিছু পাতায় পাতায় ভরা এবং উন্মুক্ত শরীরে বাইরে ঘোরারফেরা করছি আমরা, শীতে সেটার কথা ভাবাই যায়না এবং সবকিছু বরফ ঢেকে সাদা হয়ে থাকছে। ঠিক তেমনি দুটি ঋতুকে একই দিনে পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হাতের মুঠোয় এসেও যেন হারিয়ে যাচ্ছে। সিঁথান্ড নিলাম সেটা কোন মতেই না হতে দেয়ার জন্য। পরবর্তী উঁচু শৃঙ্গতে উঠতে গেলাম আমরা। ওমা! একি, এটাও তো বন্ধ! কারণ আজ উপরের আবহাওয়া ভাল নয়। সেখানে বাতাস বা ছোটখাট ঝড় হচ্ছে আজ এবং নিরাপত্তার কারণে ক্রেনগুলো উঠছে না, আর যেগুলো উঠছে সেগুলো ১৮০০ মিটার পর্যন্ত। অথচ শীতকাল পেতে হলে আমাকে আড়াই কিলোমিটারের বেশী উপরে উঠতে হবে। ট্যুরিস্ট ইনফর্মেশনে এসে খুব ভাল করে সমস্ত চূড়াগুলো সম্পর্কে ইনফর্মড হলাম। নাঃ, আজ কোন ভাবেই ১৮০০ মিটারের উপরে গুটা সম্ভব হবে না এবং উপরের এই আবহাওয়ার আজকালের মাঝে পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনাও নেই। অসহায় আমি নিরুপায় হয়ে হতবাক। দীর্ঘদিন এখানে অবস্থান করারও প্রশ্ন আসেনা। শুষু এটুকুই জানি, কোন না কোনভাবে এই গ্রীষ্মে বরফের রাজ্য ভ্রমণের এই বিরল সৌভাগ্য ছাড়তে রাজি নই।

হঠাৎ মনে পড়লো, আসবার সময় দেখেছিলাম মাউন্ট ইন রেল উপরে উঠে যেতে। জিজ্ঞাস করলাম ইনফর্মেশনে। ঈ! এগুলো এ আবহাওয়াতেও নিরাপদ এবং উপরে উঠছে, আর সবচেয়ে মজার কথা হলো ট্রেনগুলো বরফের রাজ্যে যাচ্ছে। ইলেক্ট্রিক ট্রেনটা পর্বতের শরীর বেয়ে যত উপরে উঠছে নীচের ঘরবাড়িগুলো ক্রমশঃ তত ছোট হয়ে আসছে। ডিজিটাল মাধ্যমে তোলা ছবিতে তৎক্ষণাত দেখলাম নীচের ছোট ছোট ঘরবাড়িগুলোকে। ট্রেন তার শেষ স্টেশনে এসে পৌঁছেলো। অধীর আগ্রহ নিয়ে নেমে হতাশ এবং বিস্মিত দুটোই হলো। হত্যাশের কারণ, বরফের রাজ্যে আমরা নই। বিস্ময়ের কারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। চূড়ার উপরে আমরা নই, তবে গুগুলো একেবারে নিকটবর্তী। প্রচণ্ড বাতাস সত্ত্বেও রৌদ্রময় দিন। কি করে সেই সৌন্দর্যের বর্ণনা দেব, শুষু ডিজিটাল মাধ্যমে ধরে রাখবার প্রয়াস পাচ্ছিলাম। দুপাহাড়ের খাঁজ বরফের ধ্রুপদ নেমে নেমে ভরে উঠেছে। এখান থেকে একটা ক্রেন নেমে গিয়েছে সেখানে, কিন্তু আজকের বাতাসের কারণে সেটাও বন্ধ। আমাদের সহগামীরা পর্বতারোহনের জুতো পরে, জ্যাকেট গায়ে, প্রয়োজনীয় সামগ্রীসহ পেছনে বুকছাক ঝুলিয়ে এবং হাতে দুটো স্কেটিং সহযোগী ছড়ি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে এসেছে।

লক্ষ্য করলাম পর্বতের গা বেয়ে একটি পায়ে চলা অমসূন পাথর ছড়ানো পথ নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। সহগামীরা সবাই সেই পথ ধরে হুড় হুড় করে নীচে নেমে যাচ্ছে। রাজ্যটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে উপর থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তো বুঝে নিতে আমার মোটেও কষ্ট হচ্ছে না যে এরা সবাই হাইকার বা রায়লার। ট্রে নেকের উপরে উঠেছে এবং হেট নীচে নামবে। এটা ইওদের জন্য বিশেষত বয়স্কদের জন্য এক ধরনের অভিযান। আমার বা তৃতীয় বিশ্বে জনপ্রিয় করে প্রথম বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত বা প্রতিষ্ঠা লাভে সঞ্চারিতদের জন্য পুরো জীবনটাই একটা অভিযান বলে এ অভিযানের গুরুত্ব কম। আমরা পর্বতারোহনের জন্য মোটেও প্রস্তুত হয়ে আসিনি, সেই সরঞ্জামও আমাদের নেই। আমার সাথে একটা প্যারামবুলেটর, দশ মাসের একটি শিশু এবং ছয়মাসের গর্ভবতী লিপি। আমার কাঁধে শিশু প্রয়োজনীয় সামগ্রী সমৃদ্ধ একটি বুকছাক। তবে অন্য সকলের চেয়ে আর যা আমাদের অতিরিক্ত রয়েছে, তাহলে অদম্য মনোবল।

লিপিকে জিজ্ঞাস করলাম,

“নীচে নামবে?”

“একটু নামা যেতে পারে”।

“পারবে?”

“ঈঁ, পারবো”।

পাঠক, লিপির এই শারীরিক অবস্থার জন্য আমাকে অনেক ভাবতে হয়েছিল আদৌ আমরা এবার ক্যাম্পিং হিলডেতে বের হব কিনা। কেননা এতে অনেক আনন্দের সাথে সাথেও প্রচুর পরিশ্রম এবং লিপির পক্ষে সেটা আদৌ সম্ভব হয়ে উঠবে কিনা। আর সেই আমরা কিনা এখন আলপের পাথুরিয়া পথ ভাঙার সিদ্ধান্ত নিলাম কোন প্রকৃতি ছাড়াই। প্র্যামটাকে এখানে কোথাও রেখে সিভিলীকে বুক নিয়ে এবং কাপে রুক্ষাক ঝুলিয়ে আমাদের অভিযান শুরু হলো। অন্য দের যখন পর্বতারোহনের বিশেষ জুতো পরা আমার সেখানে সাধারণ স্যাম্ভেল এবং লিপির হিল টাইপের স্যাম্ভেল পরা। কিছুক্ষণ হাটার পরই নিরাপত্তার প্রয়োজনে লিপি স্যাম্ভেল খুলে হাতে নিল।

কেননা পা হড়কে পা মচকানোই নয় আরো অনেক বেশী ক্ষতি হতে পারে। যাহোক, এখন সে খালি পায়ে হাটছে। পাশ কাটিয়ে হেটে যেতে অনেকে “ব্র্যাভো” মন্তব্য করলো। অনেকটা এসে রাস্তাটা দুভাগ হয়ে গিয়েছে। ফ্রেন্স ভাষার নির্দেশনা বুঝতে না পেরে আমরা ডানদিকে চললাম। আরো অনেকটা হেটে নীচে নামার পর এক সময় দেখলাম রাস্তাটা শেষ হয়ে গিয়েছে এবং বাদবাকি টুকুন একটা লোহার মই হয়ে অনেক অনেক নীচে নেমে জমে থাকা সেই বরফের রাজ্যে শেষ হয়েছে। নীচের বরফের রাজ্যের উপরে অভিযাত্রীদের পুতুলের মত দেখাচ্ছে। কোন কোন অভিযাত্রীদল আবার ঐ বরফের উপরেই তাবু খাটিয়েছে। কোন উপায়ই নেই আমাদের পক্ষে এ মই ভাঙার। তদুপরি প্রচণ্ড বাতাসে যেন উড়িয়ে নিতে চাচ্ছে। ক্রেনগুলো বন্ধ থাকার কারণ এখন ভাল উপলব্ধি করতে পারলাম। একটু জিরিয়ে নিয়ে আমরা ফিরে চললাম।

রাস্তার সেই বিভক্তিতে এসে আবার লিপিকে জিজ্ঞাস করলাম,
অন্য দিকে কি দেখা যেতে পারে কে জানে, যাবে? অভিযান করবে আরো?
চলো, যাই না কেন।
বেশী রিস্ক নিয়ে ফেলছ কি? এখানে কিন্তু এ্যাম্বুলেন্স আসতে পারবে না।
তেনন হলে বলবো।
আবার কিন্তু উঠতে হবে এবং ওঁটার পথ নামার থেকে অনেক কষ্টকর হবে সন্দেহ নেই।
তবুও চলোই না।

পায়ের নীচে কি যেন অনুভব করছি, হয়তো পাথরের কুঁচ পড়েছে। হতে পারে, এ পাথুরিয়া পথে। তবে জুতো তো আর নয় যে আটকে থাকবে, এমনিতেই বেরিয়ে যাবে। সিভিলীটা এখন এর মাঝেও ঘুমিয়ে পড়লো। এখন ওকে সামলানো আরো কষ্টকর, কেননা নিজের ব্যালাসএখন আর সে নিজের রাখতে পারছে না, সমস্ত শরীরটাকে আমার উপর ছেড়ে দিয়েছে। অনেকটা নীচে আসার পরও দেখাগেল পথের শেষ নেই, তবে আরো নীচে লোহা দিয়ে তৈরী একটা স্টেশনের মত দেখা যাচ্ছে, ক্রেনগুলো চলছে থাকলে যেখানে এসে থামতো। ওটাই কি তাহলে গন্তব্য? কিন্তু কি আছে ওখানে বিশেষ? না কি শুষ্ক এ্যাডভেন্সার করবার জন্য ই সবাই হাটছে?

দৌড়ে ফিরে এসে লিপিকে প্রায় চিংকার করে বললাম,
“লিপি চলো, আমরা চলে এসেছি, দেখো নীচে আইস প্যালাস এবং সবাই সেখানে চলেছে”।
সত্যি? কোথায়?
এতো, এখনো অনেক নীচে, কিন্তু আর একটু নামলেই দেখা যাচ্ছে। চলো, আমাদের যেতেই হবে, এ জন্যে ইতো সারাদিন ঘুরছি।

লিপি আর না পেরে ইতিমধ্যে সিভিলীকে নিয়ে বসে পড়েছিল আমাকে এগিয়ে যেতে বলে। আমরা আবার নামতে লাগলাম এবং লক্ষ্য করলাম আমার পায়ের নীচের পাথরটা এখনো রয়েছে। বিরক্ত হলাম। এবার ওটাকে সরাতেই হবে। সরাতে গিয়ে অনুভব করলাম ওটা আসলে কোন পাথর ছিল না। পায়ের নীচে ফোঁকা পড়ে গিয়েছে এবং ইতিমধ্যে সেটা গলেও গিয়েছে। এখন মনের জোর প্রচণ্ড এবং ওতে কিছুই এসে যায়না। আমরা এলাম ক্রেন স্টেশনে। এখান থেকে এখন সিড়ি বেয়ে নীচে নামার পথ। অর্থাৎ ক্রেন চলমান হলে আমরা এতক্ষণের কষ্টটুকুন সেইভ করতে পারতাম। এখন আমাদের সিড়ি ভেঙে প্রায় সাত তলার মত নীচে নামতে হবে।

ওমা! এ কোথায় আমরা! এ যেন কল্পনাই করা যায় না। এই ভরাগ্রি মধ্যে সময়ে এখন এক বরফের প্রাসাদের মাঝে। বরফকে কেটে স্থাপত্য কলা তৈরী করা হয়েছে এর মাঝে। মনুষ্য মূর্তি, বিভিন্ন প্রাণীমূর্তি, দেয়ালে আলমিরা ইত্যাদি। সেই ছোটবেলায় জ্বলে এক্সি মোদের বরফের ঘরের কথা শুন মনের চোখে যে দৃশ্য দেখেছিলাম এখন যেন সেটাই বাস্তবে দেখা হল। আমাদের পায়ের নীচে, মাথার উপর, চতুর্দিক বরফ অথচ ঠাণ্ডায় জমেতো যাচিছই না আমরা, গ্রীষ্মের পোশাক পরিহিত অবস্থায়ও তেনন ঠাণ্ডা লাগছে না। অনেকটা সুপার মার্কেটের হিমায়িত খাবারের এলাকার মত। এখানে রয়েছে ছোট একটা ছবি তোলার স্টুডিও দুজন লোকের তত্ত্বাবধানে একটি কুকুর সহ। ডিজিটাল মাধ্যমে উচ্চ রোজগারশোনের তোলা ছবিকে ওরা তৎক্ষণাত দিয়ে দিতে পারছে প্রিন্ট করে। ওদের পরনে দেখছি শীতের পোশাক এবং শরীরাবয়বও শীতের আকৃতি নিয়েছে। কেন? একটু ভাবতেই উত্তর পেয়ে গেলাম। তাইতো, আমরাতো গ্রীষ্মের দুপুরের উত্তাপ নিয়ে প্রবেশ করেছি এবং তদুপরি আলপ ভাঙার তাপিত শরীর নিয়ে। কিন্তু এখানে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করতে হলে শরীরের তাপ ধীরে ধীরে কমে আসবে এবং ঠাণ্ডা জাকিয়ে বসবে তখনতো প্রকৃত শীতকাল শুরু হবেই। মনে মনে ভাবলাম, চমৎকার এই লোক দুজনের চাকুরী। প্রতিদিন গ্রীষ্মের সকালে জাগরিত হয়ে এরা চাকরীতে যোগ দেয় এসে শীতে এবং বিকেলে আবার ঘরে ফিরে যায় গ্রীষ্মে। আমার জন্য এমন একটা এ্যাডভেন্সারাস জব আমি দিবা কল্পনা করতে পারি।

আলপের উপর থেকে নেমে আসা ভ্রমারের ধ্বংস জমে গিয়ে কঠিন বরফের সৃষ্টি করে ভরে তুলেছে দুপাহাড়ের খাজ। সেই জমাট বাঁধা বরফের মাঝে সুড়ঙ্গ করে তার শেষ প্রান্তে তৈরী করা হয়েছে এ বরফ প্রাসাদ। বরফতো এখানে প্রকৃতির অবদান, কিন্তু তার মাঝে কৃত্রিম এই টুকুন সৃষ্টি টেনে আনছে প্রতিদিন শত শত ট্রাক্সটিকে এখানে। সব কিছুর উচ্চ মূল্য হওয়া সত্ত্বেও ট্রাক্সটদের কাছে সেটা কোন কারণই নয়। এই খরচ টুকুন করবো বলেইতো আমি বা আমরা এতদিন পরিশ্রম করে সে সম্বন্ধ করে রেখেছি। বরফ প্রাসাদ ভ্রমারের এ অভিজ্ঞতা টুকুন যেমন খরচের তুলনায় আমার জন্য দুর্লভ তেননি আমার মত হাজার হাজার ট্রাক্সটদের জমানো অর্থটাকে পেয়ে এদেশের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি হচ্ছে সমৃদ্ধ। অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবে একে অপরের পরিপূরক। এই তো ট্রাক্সটের বা পথটন ব্যবসা। অল্প ইনভেস্ট করে অধিক লাভবান হওয়ার জন্য রাষ্ট্রের এর চেয়ে ভাল বিকল্প আর হতে পারে না। এশিয়ায় এর পুরোপুরি সুফল ভোগ করছে থাইল্যান্ড। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে শুষ্ক এ উপাধি নের পথটা বন্ধ হয়ে গেলেই থাইল্যান্ডের অর্থনীতির অবস্থা ভয়াবহ হবে সন্দেহ নেই। এত বিরাট আয়ের জন্য একটা মাত্র পূর্বসর্ভ হলো রাষ্ট্রীয় ভাবে পর্যটকদের নিরাপত্তা বিধান করা। এরপর একটু প্রচারণা চালালে বাদবাকী টুকুন প্রাইভেট সেক্টরে এমনিতেই গড়ে ওঠে। এত সুন্দর আবহাওয়ার দেশ হওয়া সত্ত্বেও শুষ্ক এটুকুন পূর্বসর্ভ কি বাংলাদেশের পক্ষে কোনদিন পূরণ করা সম্ভব হয়ে উঠবে না? কি করই বা হবে? আগেতো দেশের নাগরিকের নিরাপত্তা প্রদান, সেটাইতো স্বাধীনতার এতদিন পরও সম্ভব হচ্ছে না।

এবার উপরে উঠবার পালা। প্রথমে সাত তলার মত সিঁড়ি ভাঙা এবং তার পর দু কিলোমিটারের মত এবড়ো থেবড়ো পাহাড়ি পথের ছড়ানো পথ। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম আমরা সিঁড়ি ভাঙায় যতটা কষ্ট হলো আমাদের থেবড়ো পথে সেটা আমরা মোটেই অনুভব করলাম না তো বটেই পুরোটা পথ যতটা কষ্টের জন্য আমাদের মানসিক প্রস্তুতি ছিল তদপেক্ষ অনেক সহজেই যেন আমরা উপরে উঠে এলাম। শেষ ট্রেনটি ধরে আমরা তাবুতে ফিরলাম।

“গিন্স (Giens)” ভূমধ্য সাগরীয় একটি উপদ্বীপ। ভূমধ্য সাগরের পাড়ে যাবার জন্য চোখের সামনে মানচিত্র মেলে ধরলে সবার আগে নজর ছিনিয়ে নেবে গিন্সা একটা দ্বীপই বলা যেতে পারে একে অথচ ফ্রান্সের মেইনল্যান্ড থেকে সেটা মোটেও বিচ্ছিন্ন নয়। অর্থাৎ কোন ফেরী বা টোলসেতুর ঝামেলা নেই এবং গাড়ি নিয়ে সরাসরি যাওয়ার জন্য এরচেয়ে সুন্দর বিকল্প আর কি হতে পারে। আমার হিসেবে ভুল হয়ে গেল। শামোনিখ থেকে হাইওয়ে সরাসরি এ উপদ্বীপে না আসায় দক্ষিণ ফ্রান্সের উট্টনীচু পাহাড়িয়া পথে চালিয়ে আসতে আমার ধারণার বাইরে আরো পাঁচ ঘণ্টা বেশি লেগে গেল। সকাল ১১টায় রওয়ানা হয়ে বিকেলের পরিবর্তে রাত ১০টায় গিন্সপৌ ছলাম। অর্থাৎ ১১ ঘণ্টার ড্রাইভ ছিল সর্বসম্মত। ছোট্ট সিভিলীকে তার সীটবেল্ট দিয়ে পেছনে তার বেসিসীটে বেঁধে রাখা হয়। ১০ মাসের বেসিটা ওখানেই ঘুমিয়ে পড়ে, জেগে উঠে একাকী খেলা করে, ওর অস্ফুট ভাষায় বাবা-মায়ের সাথে কথা বলার প্রয়াস পায় ইত্যাদি। কিন্তু এক সময় এত লম্বা ড্রাইভিং এ ওর ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌছে চিংকার শ্রু করলে লিপি বাধ্য হলো ওকে লুকিয়ে কোলে নিতে, চলচ্চ গাড়িতে (নিরাপত্তার প্রয়োজনে এটি বৈধ নয়)।



রাত ১০টায় গিন্স উপদ্বীপে পৌছেই পেলাম প্রচণ্ড বাতাস, কিছুটা প্রায় সামুদ্রিক ঝড়ের মত। উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলাম তাবুর কথা ভেবে। এখন একটাই উপায় হতে পারে, এমন একটি ক্যাম্পসাইট খুঁজে বের করা, যেটি দেয়াল, বৃক্ষ বা অন্য কোনভাবে ঘেরা হওয়ায় বাতাস মুক্ত স্থান পাওয়া যেতে পারে। ক্যাম্পসাইট খোজা শুরু করলাম, কেননা স্থানটি পূর্বেই নির্বাচন করলেও আমি কোন বুকিং দিয়ে আসিনি। এদিকে ক্রমশঃ দক্ষিণে চালিয়ে আসায় রাত ১০টাতেই দিবালোক অস্তিত্ব হইছে। এ অশ্বকারেই তাবু ফেলতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্যাম্পসাইট খুঁজে পেতে হবে। এলাকার কোন মানচিত্র আমার সংগ্রহে নেই এবং এখন খুঁজে খরিদ করাও সম্ভব নয়। বাইরের দিকে তাকালেই বোঝা যায় এটি একটি হাই ট্যুরিস্ট এলাকা। কথায় বলে, “ফ্রেন্স ডাইভিং, ইংলিশ কিচেন এবং জার্মান সেন্স অব হিউমার ইউরোপ খ্যাত”। অর্থাৎ ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনা। ইউরোপে আমার দীর্ঘকালীন বসবাসের অভিজ্ঞতা এ ব্যঙ্গাত্মকির সত্যতা হাড়ে হাড়ে স্বীকার করি। সত্যি ফ্রেন্সরা যেন প্রত্যেকেরই গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে একেকজন জেমস বন্ড, যেখানে স্টায়ারিং অন্য দেশীয়রা যথেষ্ট ভদ্রতা এবং ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে থাকেন।

তো এমনি জেমস বন্ডদের মাঝে আমাকে তখন অপরিচিত এলাকায় অশ্বকারের মাঝে রাজ্য প্রাইভেট স্থাপিত ছোট ক্যাম্পসাইট খুঁজে বেড়াতে হচ্ছে। খুঁজে পেলামও কিন্তু বুক করতে গিয়েই বুঝতে পারলাম মানচিত্রে ভূমধ্য সাগরের নীল জলের মাঝের এ উপদ্বীপ শুধু আমারই নয়, অন্যদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অর্থাৎ ফুল, কোন খালি পেস নেই। অসহায় হয়ে পড়লাম। এমন সময় আমাকে বিম্বিত করে এদেরই একজন কর্মকর্তা আমাকে জানালেন “এদিকে আরেকটি ক্যাম্পসাইটে পেস হতে পারে এবং ঈশ্বর রের এ দূত তার মোফা নিয়ে আমাদের সেখানে চালিয়ে নিয়েও এলেন। ক্যাম্পসাইটটি মোটেও সুন্দর ছিল না। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে আমার মনের অবস্থা তখন “একটি স্থান হলেই হয়” এমন। তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো লিপি, “রাজ্য থাকতে রাজি তবু এখানে নয়”। ব্যথিত মনে প্রস্থান করলেন ঈশ্বরের দূত। অকৃতজ্ঞতার ব্যথায় তার প্রতি আমার মন পুরোপুরি ভরে ওঠার পূর্বেই হিসেব মিলিয়ে ফেললাম আমাদের নিকট থেকে রাত প্রতিক্রিয়াতে হবে ঈশ্বরের দূতের সে কথা রিসেপশনে জানিয়ে দেয়ার স্মরণ থেকে।

আমার জার্মান ভাষায় খুশী হলেন ফ্রেন্স ভদ্র মহিলা। তিনিও কেন যেন জার্মান ভাষায় কথা বলতে ভীষণ উৎসাহী ছিলেন। স্থলে শিখে থাকবেন হয়তো। এখন রাত প্রায় ১১টা। “ক্যাম্পিং ইন্টারন্যাশনাল” এর রিসেপশনে আমি। এখানেও ফুল হলেও ভদ্র মহিলা যার এম্বলি ছুটি করে বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল আমার প্রতি সহৃদয় হয়ে কম্পিউটারে একটি খালি পেস খুঁজতে লাগিয়ে দিলেন। ডিজিটাল যন্ত্রটি অলপক্ষণেই খুঁজে দেখাল একটি পেস বুকিং সফ্টওয়্যার এখানে খালি পড়ে আছে এবং বুকিংওয়্যারের আসবার সম্ভাবনা এখন অত্যন্ত বাদ দেয়া যেতে পারে। তিনি এটি আমাকে অফার করতে রাজি হলেন তাও মাত্র ৩ দিনের জন্য, কেননা তারপর সেটি আবার বুকড। এমন দুরাবস্থায় অসীম সমুদ্রে জাহাজের সম্মান পেয়েও লিপির উত্তপ্ত তেলের তাপে আমিও গো ধরলাম আগে দেখে নিতে, পছন্দ হবে কিনা।

তিন তারকা খচিত ক্যাম্পসাইটের স্থানটি আমরা মনোনীত করলাম। এক জাতীয় নল খাগড়া ধরণের গাছ দিয়ে মোটামুটি ঘেরা হওয়ায় একটু হলেও বাতাসের দাপট কম। সাথে আনা ছোট গ্যাস হাজারটি আজই প্রথম জ্বালিয়ে আমরা বাতাসের মাঝে তাবু স্থাপনা শুরু করলাম। সহযোগিতায় এগিয়ে এলেন বাবার বয়সী পার্শ্ববর্তী ফ্রেন্স ভদ্র লোক। যদিও তার কোন প্রয়োজন ছিল না তবুও কৃতজ্ঞতা মন ভরে এলো এবং জানা কাজেও না জানার ভান করে তার সহযোগিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলাম। সত্যি কত ভাল ইউরোপের মানুষগুলো। এদের একটাই শিক্ষা, সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা। নিজের সেই খাবারে কি করে পেট পূরে, যেখানে প্রতিবেশী না খেয়ে থাকে। আর এমন একটি দেশকে আমি চিনি, যেখানে মানুষ প্রতিবেশীর খাবার কেড়ে খেতে প্রস্তুত।

এক দুঃসহ যন্ত্রনার মাঝে রাত যাপন করছি। শৌ শৌ শব্দে বাতাস এসে আছড়ে পড়ছে তাবুর উপর। যে কোন মুহুর্তে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে তাবুটাকে। গাড়িটাকে পার্ক করেছি তাবুর পাশেই যেন তাতে একটু হলেও বাতাস ঢাকা পড়ে তাবুতে আঘাত হনোতে। জানিনা অধিরের মাঝে কতটুকু শক্তি হয়েছে তাবুর স্থাপনা। সিভিলী মজা করে ঘুমচ্ছে। লিপিও ঘুমচ্ছে দেখতে পেলেও বুঝতে পারছি না আদৌ ঘুমচ্ছে না ঘুমবার ভান করে আমার মত পাহারা দিচ্ছে। আমি স্পর্শ করছি না ওকে, কেননা তাহলে ধরা পড়ে যাবার ভয় রয়েছে। আশা করছি যদি ভান করেও আমার মত পড়ে থাকে এক সময় ঘুমিয়ে পড়বে। বাতাসগুলো গাড়ি অতিক্রম করে তাবুর উপর আছড়ে পড়ছে আর আমি চমকে উঠে তাবুর ভেতরের খুঁটি দুটির দিকে ভাল করে তাকাচ্ছি। নিজেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রেখেছি তেমন পরিস্থিতিতে দ্রুত সবাইকে টান মেরে গাড়িতে ঢুকে পড়তে। যদি সাইক্লোনও শুরু হয় অন্তত গাড়িতে সবাইকে নিরাপদে রাখতে পারবো। আমার ফ্যামিলিকারটাকে ওড়াতে হলে টর্নেডোকে আসতে হবে। তবে এ এলাকায় তার আবির্ভাবের

কথা ইতিহাসে এখনো লিখিত হয়নি। আজকের জন্য যদি ইতিহাসের পাতায় নতুন তথ্যের আবির্ভাব হতে হয় তাহলে সেটা দুর্ভাগ্য আর সে রকম দুর্ভাগ্য আরো অনেক রকমের হতে পারে। যেমন এই মুহূর্তে ভূমিকম্প হয়ে এলাকাটা সাগরে মিশে যেতে পারে, লাভার স্রোত এসে আমাদের আগামী সভ্যতার যাদুঘরীয় উপাদানে পরিণত করতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে শেষ রাতের দিকে কোন এক সময় তন্দ্রায় ঢলে পড়েছি। আসলে কোন কারণে রাতে নিদ্রা অর্জিত হলে কত ধরনের ভাবনা-দুর্ভাবনার জড়াজড়ি মস্তিষ্ক ভিতরে চলে যাদের হয়েছে তারা এই মুহূর্তে তার সম্যক উপলব্ধি করছেন আর অন্যরা ঠিক সেই মুহূর্তে এই লেখাটার কথা স্মরণ করবেন সন্দেহহীন। তবে এটি দূরকালের হতে পারে, ভাল এবং মন্দ স্মৃতির। আমার জন্য আজ ভীষণভাবে দ্বিতীয়টি প্রয়োজন।

সকালে ঘুম ভেঙে অন্যদের সহ আমাকেও তাবুর মাঝে পেয়ে ভীষণ ভাল লাগলো। শৌ শৌ বাতাসের প্রবাহ বাইরে অবিরাম থাকলেও এখন দিবালোকের অন্যতম শব্দের পাশাপাশি তাকে কম শোনা যাচ্ছে। লক্ষ্য করলাম আমাদের তাবুর পাশেই রয়েছে নলখাগড়া জাতীয় এক ধরনের ঝোপ, যা ক্যাম্পসাইটকে আড়াল করে রেখেছে বাইরের থেকে। আমরা ধারণা ছিল এর মাধ্যমে আমাদের স্থানটি একটু সুরক্ষিত থাকবে। পরে বুঝতে পারলাম ঝোপটা বাতাস অল্প আটকে দিলেও তার পাতাগুলোর মাঝ দিয়ে প্রবাহিত শৌ শৌ শব্দ সাধারণাপেক্ষ বেশি। বাতাসে একটু প্রবাহ হলেই গ্যাসগুলিতে রান্না করা দুর্হ। কেননা ঢুলী-জলেও উত্তাপটা উপরের পাতকে উপেক্ষ করে বাতাসের সাথে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে। উত্তাপের সেই অব্যাহত ভ্রমণকে পরাহৃত করতে লিপি চুলটাকে তাবুর সম্মুখভাগের সিঁড়ালীর বারানদায় স্থাপন করেছে। দুই তাপ এবার বাইরের ঝড়ে বাতাসের ভিতরে ঢুক পড়া অব্যাহত কিন্তু তের সহযোগিতায় গ্যাসগন্ধ সাথে করে তাবুর ভেতরে ঢুক পড়লো। এর মাঝেই আমাদের সুপ্রভাতি কক্ষাড এগিয়ে চললো।

না, এ সৈকত আমার পছন্দ নয়। অনেক কষ্ট করে ভীড়ের মাঝে সোনার হরিণের মত পাওয়া পার্ক পে-স্টা ছেড়ে দিয়ে চলিয়ে দিলাম পরবর্তী সুন্দর সৈকতের উদ্দেশ্য। সাগরের পাড়ে আসা মূলতঃ মেডিটেরেনিয়ানের নীল জলে সাঁতার কেটে বাদবাকী সময় উত্তপ্ত বালুতে পড়ে থাকতে। বৎসরের দুই তৃতীয়াংশ শীতের ক্রান্তি কাটাতে এরচেয়ে ভাল বিকল্প আর নেই বলেই চলে আর ঐ উদ্দেশ্যই আমার মত অন্য সকলেরও সমাগোম এখানে। কিন্তু আমাকে একটি সুন্দর সৈকত খুঁজে পেতেই হবে। আজ আমরা এলাকার মানচিত্র সংগ্রহ করছি। আমি স্টিয়ারিং এ এবং মানচিত্রে লিপি। পেছনের সীটে মনের আনন্দে দা-দা-দা রত সিঁড়ালী। এই উপদ্বীপের প্রায় চতুর্দিক কেই সমুদ্র, সেখানে সুন্দর সৈকত অবশ্যই রয়েছে। অনেক ঘুরেও মনের মত সৈকত খুঁজে পাওয়া সম্ভব হলো না। যদিও পেলাম, বাতাসের কারণে অবস্থান একেবারেই অসম্ভব। শূ বাতাসের প্রবাহই নয়, সে সাথে বহন করেছে আরো সৈকতীয় বালি। কিছুক্ষণ সৈকতে অবস্থান করলেই শরীরে যথেষ্ট বালু পাওয়া যাচ্ছে। আমরা পাথরের এক বেলাভূমি খুঁজে বের করলাম এবং সেখানে ক্যাম্পসাইটের এক ঝোপের আড়ালে স্থান নিলাম বাতাস হতে কিছুটা হলেও রক্ষণ পেতে। মাদুর বিছিয়ে আমরা অবস্থান নিলাম। এতদপেক্ষ অধিক বৃথা আশা। চমৎকার রৌদ্রজল দিন। বাতাসে সাগরের নীল জলে সৃষ্টি হচ্ছে ডেউয়ের, একেবারে সেই ছোট বেলায় শরৎ চন্দ্র চটে পাখি গায়ের সমুদ্রে সাইক্লোনে পড়া “রজত শ্রু কিরিটি পরিহিত”। আমি ইনফর্মেশনে খোঁজ নিয়েছিলাম জানতে এ বাতাস এখানে সব সময়েই থাকে কিনা। না এটি শূ হয়েছে গতকাল বিকেল থেকে, আর আমরা এসে পৌঁছেছি সম্মুখ। যে কোন সময়ে পড়ে যেতে পারে। ভালোমত আমার ভবিষ্যৎের কারণেই কি অন্য ভাষিকর্মান্বিতদের ভ্রমণে হচ্ছিল। আগে বুঝি ছিল আমার পেছনে, আর এখন ধরেছে বাতাস। এদিকে গিনসে বাতাসের খবর মনে হয় ইতিমধ্যেই কোন মাধ্যম থেকে ছড়িয়ে পড়েছে। চতুর্দিক থেকে যেন পঙ্কজপালের মত ছুটে আসছে সার্বারেরা তাদের প্রজাপতির পাখার মত সার্বিপাল নিয়ে এবং ছোট বোটটার উপর সেটা সেট করে তীর বেগে ছুটে চলেছে ঐ রজত শ্রু কিরিটি পরিহিত ডেউ গুলোর উপর দিয়ে। আজ যেন এদের মহোৎসবের দিন।

অনেক ধরনের পালম্ এবং খেজুর গাছ ও দেখতে পাচ্ছি। তারমানে এখানে কি বরফ পড়ে না কখনো? নিশ্চয় নয়। কেননা তুষারপাত হলে খেজুর গাছগুলির অস্তিত্ব দেখা মিলত না। প্রমান হিসেবে আরো পেলাম কোথাও কলাগাছ। অথচ মেনে নিতেই আমার কষ্ট হচ্ছে মধ্য ইউরোপীয় অংশ সমুদ্রেও এখানে তুষারপাত হবনা! এ সমীকরণ আর মেলায়োর চেষ্টা করলাম না। এখন অপরাহ্ন এবং আমরা গিনস্ উপদ্বীপ এবং পার্শ্ববর্তী বড় শহর হায়ের্স ঘুরতে বের হয়েছি। রোদে সেই আল্পসের মাঝের কোমলতা আর নেই। এখানে ঠিক বাংলাদেশের মত তাতানো উত্তাপ। তবে গিনস্ থেকে একটু সরে এলেই আর বাতাস থাকছে না। মানুষগুলোর গাত্র বর্ণ তামাটে। অর্থাৎ ইউরোপের সাদা মানুষগুলিকে ছুটি থেকে কয়েক দিন গায়ে রোদ লাগিয়ে ফেরার পর যে বর্ণ দেখতে পাই, অনেকটা তেমন। কিছু কিছু গাছে দেখলাম খেজুর ধরে পেকে রয়েছে। শহরটি খুব সুন্দর। পার্কিং পাওয়া ভীষণ দুর্হ ব্যাপার। দ্রব্যমূল্য বেশী। অবশ্য ট্যুরিস্ট এলাকায় সেটাই স্বাভাবিক।

সারাদিনের উপভোগের ক্রান্তি নিয়ে তাবুতে ফিরে বিশ্রাম নেয়ার যে আনন্দ আজ আর সেটা হলো না। সবকিছু তাবুর ভেতরে আটকিয়ে রেখে বেরুলেও ফিরে এসে যে অবস্থা পেলাম তাতে চক্ষু ছানাবড়া। সবকিছু তেমন আছে, শূ উপরে বালুর যেন একটা স্তর পড়ে গিয়েছে অতিরিক্ত। বাইরে তো থাকার উপায়ই নেই, ভেতরে যে থাকবো, সেখানেও বালু। শূ হলো আমাদের বালু পরিষ্কারের অভিযান। প্রায় সবকিছু থেকে ঝেড়ে পরিষ্কার করে শেষে বাসন কোসনগুলো একটু দূরে নির্ধারিত বেসিনে নিয়ে এলাম। সিঁড়ালীকে এই অল্প সময়ের জন্য তাবুর মাঝে এয়ার ম্যাট্রেসের উপর একাকী ছেড়ে এলাম। বাসন-কোসন এবং খাদ্য সামগ্রী যত দূর সম্ভব ধুয়ে নিয়ে ফিরে চললাম তাবুতে। অর্ধপথ আসতেই কানে এল সিঁড়ালীর চিংকার। রাজ্যটুকু কিকরে পেরুলাম জানানোই, তাবুতে ফিরে শূ দেখতে পেলাম খেলতে খেলতে কোন এক সময় ম্যাট্রেস থেকে নীচে পড়তে গিয়ে তাবুর আভ্যন্তরীণ খুঁটিটার সঙ্গে বোচার এমনভাবে আটকে গিয়েছে যে ব্যাথায় সেখানে টিকতেও পারছে না, আবার ছুটেও পারছেন। এদিকে উত্তপ্ত মেঝের গরমে লাল হয়ে উঠেছে।

আর ভাল লাগছে না এখানে। আমরা সিঁখস্ত নিলাম আগামীকালই এই স্থান ত্যাগ করার। বাতাস পড়ে আসবার অপেক্ষায় থাকলে আমাদের ছুটির দিনই কমে আসবে। এবার আমার স্থির সিঁখস্ত, হাতে সময় নিয়ে রওয়ানা হব এবং ভাল ক্যাম্পসাইট খুঁজে বের করবো। রিসেপশানে ভাড়া মিটিয়ে সবকিছু গোছানো শূ হলো যে আগামীকাল আমরা সকালে আমরা ব্রেকফাস্টের পূর্বেই রওয়ানা হতে পারি। ব্রেকফাস্ট অন দ্য ওয়ে।

আমরা চলেছি ইটালীর উদ্দেশ্য। মানচিত্রে দেখা গেলে প্রায় সমুদ্রোপকূল জুড়ে একটি রাজ্য চলে গিয়েছে ফ্রান্স থেকে ইটালী অভিমুখে। রৌদ্রজল দিন। তো আমরা সিঁখস্ত নিলাম এ রাজ্য চালানোর। কেননা এতে যেমন সমুদ্র এবং সমুদ্রতীরবর্তী ছোট শহরগুলি চলার পথে উপভোগ করা যাবে, তেমন ব্যয়বহুল ফ্রেন্স হাইওয়ে পরিভ্রমণ করায় দুপয়সার সাশ্রয়ও হতে পারে। কেননা ইতিমধ্যে লন্ডনভিত্তিক থেকে হিসেব করে দেখেছি ফ্রেন্স হাইওয়ের টোল গাড়ির তেলের খরচাপেক্ষ অধিক, যেখানে জার্মানি, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ব্রুটেন ইত্যাদি দেশের হাইওয়েগুলো পুরো ফ্রি। বেশ চলছিলো আমরা। সুন্দর রাজ্য স্টায়ারিংএ লিপি এবং মানচিত্রে আমি। সমুদ্রতীরবর্তী দৃশ্য গুলি অপূর্ণ। ছোট ছোট শহরগুলি একের পর এক পার হয়ে চলেছি। সবগুলোকে আমার প্রায় একই ধাঁচের মনে হচ্ছে। সজানো গোছানো পরিপাটি, উদ্ভাস একটাই, ট্যুরিস্ট আকর্ষণ। রাজ্যের পাশে একটু উঁচুতে মাঝে মাঝেই অপূর্ণ সুন্দর ডিজাইনের বাড়িগুলি চমৎকার সব ব্যালকনি সমৃদ্ধ। ঐ ব্যালকনিগুলো থেকে নীল এ সমুদ্র সত্যি কত সুন্দরই না দেখাবে। বাড়িগুলো সব ফুল ফুলে ভরা। স্থায়ী সৌন্দর্য এর চেয়ে আর কতটুকু বেশী হতে পারে। বুঝে নিতে মোটেও বেগ পেতে হয় না এগুলো সব পৃথিবীর সমস্ত সম্পদশালী মানুষগুলোর লীলাভূমি।

গাড়ী থেমে গেল। সামনে ট্রাফিক জ্যাম। সবসময় আমরা প্রায় দু'ঘণ্টার মত ট্রাফিকজ্যামে আটকা পড়ে থেমে রইলাম অথবা ধীরে চালাতে বাধ্য হলাম। দুর্গম এলাকার কারণে এই একটিই মাত্র রাস্তা এদিকে বলে জ্যাম থেকে বেরিয়ে যাওয়ারও কোন উপায় নেই। আজ আমার মত সমুদ্রতীরবর্তী রাস্তা ধরে চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত আরো অনেকেই নিয়েছে। এজন্য সড়কানুযায়ী অধিক ট্রাফিক জ্যামের কারণ। মূল্য বান দুটি ঘণ্টা নষ্ট হওয়ার পর আমরা হাইওয়েতে ওঠার সংযোগ সড়ক পেলাম। অনেকগুলো মঠ, গুহুজ বা পিরামিডকে এক সারিতে রেখে ওদের মাঝখান দিয়ে একটি দন্ড বা রড চুকিয়ে দিল। আমাদের হাইওয়েটি এক্ষেত্রে ছিল ঠিক তাই। অর্থাৎ শুধু পাহাড় আর পাহাড় এবং তার মাঝ দিয়ে সড়কজ্ঞাকরে হাইওয়ে তৈরী করা হয়েছে। সড়ক থেকে বেরু লেই দু পাহাড়ের খাঁজে ব্রীজ যার নীচের দিকে তাকালে শিউরে উঠতে হয়। এটিও সাগরের পাড় ঘেষেই তৈরী হয়েছে। সড়ক থেকে বেরিয়েই সাগর দেখতে পাচ্ছি অল্প সময়ের জন্য , আবার পরবর্তী সড়কজ্ঞাকরে যাচ্ছি।



ইটালীর গেনুয়া শহর পার হয়ে সাগরের তীর ধরে আরো খানিকটা চালিয়ে এলাম। এখন বিকেল। হাইওয়ে ধরে চালিয়ে আসায় আজ তেমন সময় নষ্ট হয়নি। “লা স্পেৎসিয়া (La Spezia)” শহরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সিদ্ধান্ত হলো এখানেই হস্ট করার। মানচিত্রের আকার বলে এটি একটি বড় শহর। এর গা ঘেঁসেই দেখা যাচ্ছে সমুদ্র সৈকতবর্তী একটি উপশহর মানচিত্রে “লোরিছি” নামে। আমরা সেখানে চলে এলাম। হাতে সময় রয়েছে এবং এবার আমি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ আগে থেকে দেখে নিয়ে একটি ভাল ক্যাম্পসাইট খুঁজ পেতে এজন্য যতই ঘুরতে হোক এবং যত ব্যয়বহুলই হোক না কেন।

আমরা এখানকার প্রথম ক্যাম্প সাইটটিতে এলাম। আমার বলার পূর্বে ওরাই আমাকে আমাদের কোন স্থানটি দেয়া যেতে পারে ঘুরে দেখাতে চাইল। মাত্র দুটি স্থান খালি রয়েছে এবং অন্য গুলোতে সব তার ফেলা। স্থানগুলি ছোট হলেও একটি আমার খুব ভাল লাগলো। একেবারে সৈকতের উপরেই বলা যেতে পারে। তবে সাগরের তীর এখানে বালুর পরিবর্তে কঠিন পাথরের তৈরী আর তার উপরে খাড়াভাবে দেয়াল তৈরী করে কয়েকটি ধাপ তৈরী করা হয়েছে এবং এ ধাপগুলিতে তবুর জন্য স্থান বরাদ্দ করা হয়েছে। আমাদের ধাপটি সবার নীচে অলিভ গাছের ছায়াতে, অর্থাৎ পায়ের নীচেই সমুদ্র আর সমুদ্রের বিশাল ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে পাথুরে উপকূলে। নীচের দিকে তাকালেই বোঝা যাচ্ছে প্রচণ্ড বাতাস অথচ উপরে একটুও বাতাস নেই। রৌদ্রজ্বল দিন। পাশেই একটি সিঁড়ি নেমে গিয়েছে নীচে পাথুরে সৈকতে এবং সেখানে লোহার রড দিয়ে তৈরী করা রয়েছে জলে নামার ব্যবস্থা, ঠিক যেন সুইমিং পুল। ভীষণ পছন্দ হলো আমাদের। একমাত্র সমস্যা হলো গাড়ি সাথে রাখার ব্যবস্থা নেই। অর্থাৎ সমস্ত মালামাল একবার টেনে আনতে হবে এবং আবার টেনে গাড়িতে নিতে হবে। মূল্যের কথা শুন চক্ষুচড়কগাছ হলো, তবুও আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম এখানেই ঘাটি করতে।

মনের মত করে আমরা আমাদের স্থানটিকে সাজালাম। ক্যাম্পিং এর অভিজ্ঞতা আমার পূর্বেও অনেক হয়েছে। কিন্তু এমন সুন্দর স্থান কোথাও পাইনি। আমাদের পাশেই এক গুলনদাজ যুগল রবার্ট ও লিডিয়া কিছুক্ষণের মাঝেই সিভিলিয়ার সাথে ভাব জমিয়ে ফেলল। কিছুক্ষণ পর আমাদের আমাদের অন্য প্রতিলোকীরাও ফিরলো। তিনজন যুবক, হয়তো বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হতে পারে। কথা বলে জানতে পারলাম ওরা জার্মান এবং এসেছে আমাদের ফ্রাংকফুর্টের প্রতিলোকী শহর মানহাইম থেকে। খুবই ভাল তিনটি ছেলে। আমরা লক্ষ্য করলাম এখানে যুবক যুবতীদের সংখ্যা তাই বেশী এবং ফ্যামিলির সংখ্যা খুবই কম। কারণ যুক্তিসংগত, দুর্গম এ ক্যাম্পসাইট বাচচাদের ততো উপযোগী নয় এবং যৌবনের যেন স্বপ্নভূমি। এমতাবস্থায় আমাদের ছোট্ট ফ্যামিলি এবং সর্বকনিষ্ঠ সিভিলিয়ার সবারই নজর এবং স্বাগতম কেড়ে নিচ্ছিল। সন্ধ্যা হলো, আবার আমাদের পিকনিক শুধু হলো যেন দীর্ঘকাল পর।

প্রায় কুড়ি মিটার পায়ের নীচে সাগরের জলে প্রচণ্ড আলোড়ন। প্রচণ্ড প্রচণ্ড ঢেউগুলি এসে আছড়ে পড়ছে তীরে অথচ কুড়ি মিটার উপরে কোন বাতাসের চিহ্ন মাত্র নেই। নীচের জলের এ আলোড়ন আমরা শুধু উপভোগই করছি কোন প্রকার ভোগান্তি বা উপদ্রব ব্যতিরেকে। রাতে কয়েকবার আমার ঘুম ভেঙেগেল ঢেউ এবং বাতাসের গর্জনে। আবার কি খারাপ আবহাওয়া আমাদের পিছু তাড়া করলো? তারু হিরা। চিহ্ন মাত্র বাতাসের নেই কোনখানে। আরামদায়ক তাপমাত্রা, মুক্ত আকাশ একেবারে ক্যাম্পিং এর জন্য যে আবহাওয়ার প্রয়োজন, একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ। এক পরিতৃপ্ত মন নিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ি।

পরবর্তী সকাল। রৌদ্রজ্বল দিন। আমাদের ক্যাম্পসাইটের রয়েছে একটি নিজস্ব ছোট সুপার মার্কেট। প্রয়োজনীয় সবকিছু সেখানে থেকে সংগ্রহ করে বিশাল ব্রেকফাস্টের আয়োজন হল। ক্যাম্পনা সদৃশ এ বাস্তবতায় প্রাতঃরাশের ব্যাপকতায় আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। তো অতঃপর অলিভ গাছের ছায়ায় নীচে সাথে আনা ডেকচেয়ারে গা এলিয়ে দিলাম। খুব দূতই আমাদের সিদ্ধান্ত এ একা মতে উপনীত হলো যে এমন সুন্দর উপভোগ্য পরিবেশ ফেলে আজ আমাদের কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে নেই। আমাদের পার্থক্য সৈকতে অনেকে ঢেউ থেকে নিরাপদ দূরত্বে মাদুর বা তোয়ালে বিছিয়ে বিকিনি বা অনুরূপ সুইমিং কস্টউম পরে গা এলিয়ে দিয়ে শরীরে রোদ লাগাচ্ছে এবং পছন্দানুরূপ উপন্যাস বা গল্প পড়ছে।

এখন দুপুর। আমরাও সেখানে এলাম। লিপি সিভিলিয়ারকে কোলে নিয়ে একটি উঁচু পাথরের উপর বসলো ঢেউয়ের আঘাতের বহির্গাভিতে। আমি পাশেই কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি। প্রচণ্ড ঢেউগুলো নীচে আছড়ে পড়ছে।

হঠাৎ একটি ঢেউ আমাদের ধারণাকৃত গভীরে ছাড়িয়ে এসে আছড়ে পড়লো ওদের দুজনের উপর। দুজনেই ভিজে একাকার। সিভিলিয়ার ভয় পেয়ে কান্না শুরু করলো। শান্তনার পরিবর্তে আমি দৌড়ে তাবুতে ফিরলাম এমন একটি দুর্লভ মুহূর্ত কে ধরে রাখার উদ্দেশ্যে ক্যামেরার সন্ধানে। সাহস বেড়ে গেল এবং এভাবে ওরা কয়েকটি ঢেউকে উপভোগ করলো। এবার আমার পালা। জলে নামার প্রস্তুতি আসছে না। কেননা প্রচণ্ড ঢেউয়ের তোড় উপকূলে এনে ছিটকে ফেললে লোহা সদৃশ পাথরের সাথে আঘাতে হাড় ভেঙে যাবে সন্দেহ নেই। তো আমি লিপির হাতে ক্যামেরা দিয়ে অ্যামিভেস্সারকে চিত্রায়িত করার উদ্দেশ্য আরো একটু নীচে নেমে একটা পাথরের উপর নিজেকে মজবুত করে স্থাপন করে ঢেউয়ের অপেক্ষায় রইলাম। ঠাঁই ঢেউগুলো এসে ইতিমধ্যেই আমাকে ভিজিয়ে দিয়েছে আর আমি বন্ধুদের পরবর্তীতে আমার অ্যামিভেস্সার দেখানোর কথা স্বপ্নে এনে উপযোগী পোজ দিতে

বাস্ত হলাম। জল প্র চড় লবনাক্ত, জিভ দিয়ে ঠোট স্পর্শ করলে বমি হবার উপক্রম। এবার ঘটনা ঘটলো। ঢেউঝুবরাজ এসে এবার আমাকে আমার স্থাপনা থেকে এক ঝটকা মেরে সরিয়ে দিল। আর একটু হলেই নীচে ফেলে দিয়েছিল আর কি। জলের বাড়ি এত প্র চড় হতে পারে কে জানতো। ফিলি সেই ইমেজ কোথায় মিলিয়ে গিয়ে এবার আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। উপরের পাথরের কোন একটা অংশকে দুহাত দিয়ে মজবুত করে ধরলাম নিজেকে রক্ষা করতে। এবার এলেন চেউরাজ। আমার শরীরকে কাগজের মত ভাসিয়ে নিল। শু দুহাত দিয়ে আটকে ধরে থাকায় জলের নীচেও নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারলাম। পাথরের অসমতল উপরিভাগের সাথে ঘষে যাওয়ায় পায়ের নীচে ছড়ে গিয়েছে, তাতে কিছুই এসে যায় না কিকরে নিজেকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করবো ইফ্টনাম জপ করতে করতে সেই অপেক্ষায় রইলাম। কেননা যে মুহূর্তে হাত ছেড়ে উপরে উঠতে চেষ্টা করবো ঐ মুহূর্তে আরেকটি ঢেউ এসে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তবুও আমাকে রিস্ক নিতেই হবে এবং নিলামও।

একটু শুরুরেই শরীরের উপর লবন চড় চড় করে উঠলো। তাবুর পাশেই এ প্রয়োজনকে লক্ষ রেখে শাওয়ারের ব্য বস্থা করা রয়েছে। একেবারে সিভিলি সহ সবাই সেটার নীচে চলে এলাম। ইচ্ছামত ভিজলাম সবাই শাওয়ারের পরিচ্ছন্ন জলে। এবার লক্ষ করলাম, আমাদের এ মজা করা দেখে রবার্ট, লিডিয়া সহ এবার অন্যরাও ঢেউয়ের জলে ভিজতে চললো। অতঃপর আমরা আবার গা এলিয়ে দিলাম অলিভের নীচে রৌদ্র ছায়ার মাঝে। বিকেলে আবার এলাম সুপার মার্কে টে। মার্কে টের বিক্রেতা প্রশস্ত বস্ত্রের অধিকারী লোকটিকে দেখলে মধ্য যুগীয় ছবিগুলিতে দেখা সেই রোমান সৈন্যের কথা মনে পড়ে যায়। তবে একটু কথা বলতেই তাকে খুব আন্তরিক এবং যথার্থ বলে মনে হল, অর্থাৎ কথায় এবং কাজে এক। আমি তাকে বললাম যে আমরা সম্প্রায় একেবারে খাটি ইটালীয়ান খাবার খেতে চাই। সত্যি কার হাসিতে মুখাবয়ব আলোকিত করে লোকটি ছোট সুপার মার্কে টের সীমিত আয়োজন থেকেও তৎক্ষণাত আমাদের জন্য স্পেগেটি, স্পেগেটি রান্নার সঠিক তৈরী মশলা, উপযোগী তেল এবং আনুসঙ্গিক যোগাড় করে আনলো এবং তাতেই ক্ষমতা না হয়ে লিপিকে সুন্দর করে বুঝিয়ে বলতে লাগলো রান্নার পদ্ধতি। এদের দুজনের কথোপকথনের কিছুই আমি বুঝতে পারছিলাম না বা বোঝার প্রয়োজনও বোধ করছিলাম না বরঞ্চ দুজন ভিনদেশীর ভিন্ন ভাষায় (ইংরেজী) কথোপকথনের নিজস্ব আঞ্চলিকতার টান থাকা সত্ত্বেও প্রাসঙ্গিকতার অভিন্নতায় সমঝোতার পরিবেশকে ভীষণভাবে উপভোগই ব্যস্ত হয়ে পড়ি। ইটালীতে যে বিষয়টি ভীষণভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, তাহলো এদের যথার্থতা। অর্থাৎ জার্মানদের ব্য বহারে যে কুটনৈতিকতা রয়েছে (অর্থাৎ মুখাবয়ব এবং মনের ভাবের অসাদৃশ্য) তা এদের মাঝেই একেবারেই অনুপস্থিত। এশিয়ানদের মাঝে পাঠানদের সম্পর্কে এমন কথা শোনা যায়, যারা মুখেও যে কথা বলবে, কাজেও সেটাই করবে। কাউকে মন থেকে পছন্দ না হলে উপরে খুশী করবার জন্য সুন্দর কথা শোনাবে না। আমার অভিজ্ঞতায় এটি বেশী লক্ষ্য করেছি জার্মান এবং ইংলিশদের মাঝে।

সম্প্রায় লিপি ইটালীয়ান ডাইনিং টেবিল সাজাল। স্পেগেটি টেস্ট করে বিস্মিত হলাম। এত সম্পূর্ণ আলাদা! এমন স্পেগেটিতো কোথাও খাওয়া হয়নি। স্পেগেটি এখন আর ইটালীতে সীমাবদ্ধ কোন খাবার নয়। এটি এখন পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যায়। সেই সুবাদে কতই না খাওয়া হয় স্পেগেটি, কিন্তু এ যে সম্পূর্ণ আলাদা। এতক্ষণ ওদের কথোপকথনের যথার্থতা অনুধাবন করলাম। লিপিকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম সম্পূর্ণ কৃতিত্বের দাবীদার সাথে দেয়া মশলাটির। সত্যি তো, আজকাল ভারতীয় খাবারওতো পৃথিবীর সর্বত্রই পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু তার সত্যি কার স্বাদ কি হয় তা একজন ভারত উপমহাদেশীয় যখন উপমহাদেশের বাইরের কোন ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁতে খেতে যান তখন উপলব্ধি করেন। কষ্ট যতই হোক না কেন, পাটায় বাটা ঐ মশলার যেন তুলনাই হয়না। ঠিক তেমনি এক ধরনের নরম মশলা আমাদের পলিথিনের প্যাকেটে করে দেয়া হয়েছিল।

আমাদের পাশে এখন আরো একটি তাবু বসেছে। এখানে এসেছে দুজন ইংলিশ ছেলে এবং একজন মেয়ে। ওদের সাথে রবার্ট ও লিডিয়ার খুব জমে উঠেছে। সাথে যোগ দিয়েছে আশে পাশের তাবু থেকে আরো কয়েক জন। সবাই মিলে বার্বিকউ করছে ওরা আর ড্রিঙ্ক। হৈ হল-ভীষণ জমে উঠেছে। আলাপে সমালোচনার একজন না থাকলে কেমন যেন জমে ওঠে না। ওদের মজার আলোচনায় আজকের সমালোচনার বিষয় হয়েছে জার্মানি। উল্লেখ্য যে ইংলিশদের সমালোচনার টার্গেট সব সময়ই জার্মানি হয়ে থাকে। বিশেষ করে যেদিন দুদেশের ফুটবল খেলা থাকে তখন অনেকটা যেন বিশ্বযুদ্ধের দামামা শুরু হয়ে যায়। এ বৎসরের ইউরোপিয়ান ফুটবলে শক্তিশালী জার্মানির প্রথম রাউন্ডেই বিদায় ইংল্যান্ডের জন্য নিশ্চয় উপভোগের বিষয় হয়েছিল সন্দেহ নেই। তো আমাদের বার্বিকউ টিম আজ গান ধরলেন, “শাডে ডয়েচল্যান্ড, আলেস ফরবাই”। অর্থাৎ যার বাংলা দাড়ায়, “কি দুঃখ জার্মানি, সব কিছু শেষ হয়ে গেল”। আমার বুঝতে বাকি রইলনা গানটি নিশ্চয় ফুটবল স্টেডিয়ামে ইংলিশ ফ্যানদের কর্তৃক জার্মান ভাষায় তৈরী হয়েছিল। হাসবো না কাঁদবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। জার্মানিকে বাজা করা হচ্ছে, অথচ তার মাঝেও কৌতুক কত। হাসিতে লুটিয়ে পড়লাম আমরা।

মূল্য বান সময় নষ্ট হচ্ছে আমাদের অন্য দেশ ঘুরে দেখার অথচ আমাদের এত সুন্দর ক্যাম্পসাইট এবং তার পরিবেশ ছেড়ে বাইরে যেতেই ইচ্ছা করছে না। আমার একবার ভয় হলো যে লিপিও ইচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে খুশী করতে হাঁ বলে যাচ্ছে কি না। ভালবাসায় এমনটা হয়। একজন অপর জনের ইচ্ছার কাছে নিজের ইচ্ছাকে সপে দিয়েও সুখ পায়। সেটাও সুখ সন্দেহ নেই কিন্তু সবচেয়ে ভাল তখনই যখন দুজনের চাওয়া একই কথা বলে। কৌশল করে আজকের দিনের পরিকল্পনার ভার ওর উপর দিয়ে দিলাম। ওমা ওরওতো একই অবস্থা, একদম কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা নেই! অথচ ঘুরে দেখবার জন্য ইতো আমাদের বাইরে আসা। ঘরে বসেতো বাসাতেই থাকা যেত, এত দূরে আসবার প্রয়োজন আদৌ ছিল কি? শেষ পর্যন্ত আমরা উপভোগের উপরে আমরা আমাদের ছেড়ে দিলাম। ঘুরে দেখতেই হবে এমন নয়। ছুটিতে এসেছি উপভোগের জন্য এবং যেখানে বেশী হবে আমরা তাই করবো। তো আবার তাবুর সামনে অলিভের নীচে গা এলিয়ে দেয়া।

আজ এখন আমাদের লেরিছিতে তৃতীয় দিনের বিকেল। আলসেমী কাটিয়ে সিঞ্চ হলে “লা স্পেৎসিয়া” শহর দেখতে যাবার। প্র চড় পাহাড়িয়া এলাকার মাঝে কত পরিকল্পনা ও কষ্ট করেই না শহরগুলি গড়ে উঠেছে। ভাবার চেষ্টা করলাম আজ থেকে ২৫০০ বৎসর পূর্বের কথা। এই পাহাড়ের মাঝে রোমানরা সৃষ্টি করেছিল পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত সভ্যতা। কত শত বৎসর যাবৎ টিকে ছিল সেই সভ্যতা এবং ইউরোপ হয়ে এশিয়া আফ্রিকাতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। পাহাড়িয়া জঙ্গলগুলো সহ সর্বত্র শু অলিভ গাছ। রোমানরা কি তাহলে এই অলিভের বদৌলতেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ইটালীয়ান শহরগুলোকে একটু পুরোনো মনে হয় আমার কাছে। নতুন ঘরবাড়ি তৈরী করলেও বাইরের দিকে ওরা ওদের প্রাচীন রোমান ঐতিহ্যকে বজায় রাখতে বশ্ পরিকর। আর ইটালিতে এলে মনে হয় বাংলাদেশের অনেক কাছাকাছি চলে এসেছি। এদের রাজ্য-ঘাট, ঘর-বাড়ি সহ টয়োলেট পর্যন্ত সব কিছুতেই বাংলাদেশের সাথে অনেক মিল পাওয়া যায় যেখানে জার্মানিতে সব কিছুতেই আধুনিকতার ছোয়ায় পার্থক্য অনেক। মানুষগুলোর সাথেও যেন আমাদের অনেক মিল; সহজ, সরল, সাধারণ মানুষগুলো, জার্মানদের মত উদ্ভাসিক নয়। লা স্পেৎসিয়া শহরটি অন্য অন্য ইটালীয়ান শহরগুলো থেকে ব্যতিক্রম নয় শু সাগরের দিকে যে নতুন শহর গড়ে উঠেছে সেটি পুরোপুরি আধুনিক মুন্সিয়ানায়। বিকেলকে উপভোগের জন্য এর থেকে সুন্দর স্থান কমই হতে পারে। এজন্য পার্কিং পেতে আমাদের প্র চড় বেগ পেতে হলো। এখানে বাইরে ব্য বসরত কয়েকজন অত্যন্ত আন্তরিক বাঙালি ভদ্র লোকদের সাথে আমাদের পরিচয় হলো।

সুপার মার্কে টের রোমান সৈনিক আজ আমাদের ইটালীয়ান পাজার সরঞ্জাম দিলেন এবং আমরা জন্য দামী একটি হোয়াইট ওয়াইন। আজ আমাদের কা স্পিং হিলডের শেষ দিন। আগামীকাল ফিরে যাবার পালা। ব্যাথায় ভরে আসছে মন। এজন্য আজকের সন্ধ্যাটাকে আমরা অন্য রকম করে সাজিয়েছি। অনেক স্মৃতিচারণ এবং অনেক কথার মাঝ দিয়ে সময় কেটে যাচ্ছে আমাদের। সিভিলি ওর খাবার খেয়ে ঘুমুচ্ছে তাবুর মাঝে। কত কথা

বলেছিলাম, কি কি আমাদের প্র সজ্জাছিল আজ আর মনে নেই, শু এটুকুন বলতে পারব সবকিছু অপরিসীম ভালবাসা জড়ানো ছিল। এক সময় লক্ষ করলাম রোমান সৈনিকের বেছে দেয়া বোতলটি অবশেষে শু। এবার খাবার। আজকের আয়োজন পাস্তা এবং একই রকম গতকালের স্পেগেটির মত এক অতুলনীয় স্বাদ। কয়েকজনের খাবার মনে হয় একাই সাবাড় করে দিয়েছিলাম। ধন্য বাদ আমাদের রোমান সৈনিককে, ধন্য বাদ ইটালীকে আমাদের এমন সুন্দর সময় এবং পরিবেশ দেওয়ার জন্য। বাসা থেকে ইতিমধ্যে আমরা বহু বহু দূরে চলে এসেছি। আগামীকাল শু গোছানোর এবং ঘরে ফেরার পালা।